মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

গভীর সংকটে মিশর

মিশর আজ এক জটিল রাজনৈতীক সংকটের আবর্তে। দেশ ধাবিত হচ্ছে রক্তাত্ব সংঘাতের পথে। কয়েক দিন আগে কায়রোর রাজপথে সংঘাতে ৭ জনের মৃত্যু ঘটেছে,আহত হয়েছে ৬৪০ জন -(খলিজ টাইমস, ৮/১২/১২)। কোন দেশেই কোন বিপ্লব রাতারাতি যেমন শুরু হয় না,তেমনি শেষও হয় না। এটি হলো আমূল পরিবর্তের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা। বিপ্লবের প্রসববেদনা সচারাচরই অতি দীর্ঘ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেটি রক্তাত্বও। তখন অনিবার্য হয়ে উঠে জানমালের বিপুল কোরবানী। সেটি যেমন ফরাসী বিপ্লবে ঘটেছে,তেমনি রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবে ঘটেছে। ঘটেছে ইরানের বিপ্লবেও। মিশর সম্ভবতঃ সে পথেই ধাবিত হচ্ছে। রাজপথে মিছিল,তাহরির স্কোয়ারে ধর্ণা,হুসনী মোবারকের পতন,নির্বাচন এবং নির্বাচন শেষে সরকার গঠনকে যারা বিপ্লব ভেবেছিল তাদের এখন আশাভঙ্গ হওয়ার দিন। বিপ্লবের সামনে এখনও বহু পথ বাঁকি। যে কোন বিপ্লবের বিরুদ্ধে বার বার প্রতিবিপ্লবের চেষ্টা শুধু স্বাভাবিকই নয়,বরং সেরূপ না হওয়াটিই অস্বাভাবিক। বিপ্লবীদের এখানেই বিশাল পরীক্ষা। বিপ্লবের এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। মিশরে সেটি শুরুও হয়ে গেছে। ইরানের বিপ্লবে সে দেশের বহুশ্রেষ্ঠ সন্তানকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আয়াতুল্লাহ মোতাহারী,আয়াতুল্লাহ তালেগানী,আয়াতুল্লাহ বেহেশতীর ন্যায় প্রথম সারির ধর্মীয় নেতাদেরকে প্রতিবিপ্লবীরা হত্যা করেছে।হত্যা করেছে দেশের প্রেসিডেন্ট রেজায়ী ও প্রধানমন্ত্রী বাহানূরকে। বিপ্লবের একবছরের মধ্যে ৮ বছরের এক ভয়ানক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে তাতে ১০ লাখের বেশী মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

ইরানের বিপ্লবের চেয়েও মিশরের বিপ্লব হবে আরো যুগান্তকারি। শিয়া হওয়ার কারণে ইরানের বিপ্লব তার ভূগোল দ্বারা সীমিত হয়ে গেছে। কিন্তু মিশরের বিপ্লব সফল হলে তার প্রভাব শুধু মধ্যপ্রাচ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না,সমগ্র মুসলিম বিশ্বকে তা প্রভাবিত করবে। সে প্রভাব ইতিমধ্যে ফলতেও শুরু করেছে। সেটি দেখা গেছে সাম্প্রতিক হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে। ফলে এ বিপ্লবের বিরুদ্ধে নাশকতাও হবে অতি বিশাল ভাবে। এবং সেটিও শুরু হয়ে গেছে। মিশর এখন দ্বি-জাতিতে বিভক্ত। একটি ইসলামের পক্ষের,অপরটি ইসলামের বিপক্ষের। ইসলামের বিপক্ষ শক্তিটি কোন একক দল নয়,বরং এক বৃহৎ কোয়ালিশন। প্রাক্তন স্বৈরাচারি শাসক হোসনী মোবারকের দলের লোকজনের সাথে এ কোয়ালিশনে শামিল হয়েছে শুধু সোসালিস্ট,সেক্যুলারিস্ট,ন্যাশনালিস্টগণই শুধু নয়,বরং শামিল হয়েছে দেশের খৃষ্টানগণও। তাদের সামনে একটিই লক্ষ্য এবং একটিই এজেণ্ডা। সেটি হলো যে কোন প্রকারে মিশরে ইসলামী শক্তির বিজয়রোধ। সে সাথে ইসলামি আইন শরিয়তের প্রতিষ্ঠা রোধ। তাদের সমর্থণে রয়েছে সমগ্র অমুসলিম বিশ্ব,বিশেষ করে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশগুলি। তাদের সাথে রয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের সকল স্বৈরাচারি রাজাবাদশাহ ও শাসকবৃন্দ। বিপ্লবের এসব শত্রুদের কেউই চায়নি,মিশরে ইসলামি শক্তির বিজয় হোক। এখনও চায় না,দেশটিতে আল্লাহর শরিয়তি বিধান প্রতিষ্ঠিত পাক। তারা কেউই প্রেসেডেন্ট নির্বাচনে ইখওয়ানুল মুসলিম দলের মুহম্মদ মুরসির বিজয় চায়নি। কিন্তু তাদের হতাশ করে জনাব মুহম্মদ মুরসী বিজয়ী হয়েছেন। মুহম্মদ মুরসীর বড় অপরাধ এখানেই।

1 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

আগাছা শুধু জমিনের উপরই বাড়ে না,শিকড়ও গভীরে যায়। তাই শুধু আগাছার গোড়া কাটলেই সে জমিনে ফসল ফলানো যায় না,মাটির গভীর থেকে শিকড়ও উপড়াতে হয়।সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ কাফেরগণ তাদের ১৯০ বছরের ভারত শাসনে যেভাবে সেক্যুলারিজমের বিশাল বিশাল বৃক্ষ রোপন করে গেছে তাতে ১৯৪৭ সালে তাদের বিতাড়নের পরও পাকিস্তানীদের পক্ষে ইসলামের শরিয়তী বিধানের দিকে ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়নি। সেক্যুলারিস্টদের কারণে ব্যর্থ হয়ে যায় উপমহাদেশের নানাভাষাভাষি মুসলমানদের পাকিস্তান প্রজেক্ট। প্রতিটি মুসলিম দেশেই এসব সেক্যুলারিস্টরা ঘরের শত্রু। অথচ পাকিস্তান আন্দোলন কালে মুসলিম লীগের স্লোগান ছিল,“পাকিস্তান কা মতলব কিয়া? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” লক্ষ্য ছিল,বিশ্বের সর্ববৃহৎ এ মুসলিম রাষ্ট্রটিকে বিশ্বমাঝে ইসলামের সিভিলাইজেশন ফোর্স রূপে খাড়া করা। কায়েদে আযম বলতেন,“কোরআনই আমাদের শাসনতন্ত্র”। কিন্তু তা সম্ভব হয়নি। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের দীর্ঘ শাসনে শুধু শিকড়ই রেখে যায়নি,বড় বড় গাছও রেখে যায়। কিন্তু ১৯৪৭ সালে সেগুলো নির্মূলের কোন চেষ্টা না করে তার গোড়ায় পানি ঢালা হয়েছে। ফলে দিন দিন সেসব গাছ থেকে শুধু বিষই ফলেছে।

বিচারপতিদের নাশকতা

যে কোন বিপ্লবের কাজ শুধু রাজনৈতীক বিপ্লবে শেষ হয় না। আমূল বিপ্লব আনতে হয় বুদ্ধিবৃত্তি,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে। সেটি না হলে বিপ্লব যে ব্যর্থ হয়ে যায় সে প্রমাণ প্রচুর। বিপ্লব সে কারণে ব্যর্থ হয়েছে আলজিরিয়ায়। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে জিহাদ বলা হতো। ইসলাম ও ইসলামপন্থিদের সে জিহাদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সে বিপ্লব হাইজ্যাক হয়ে যায় বামপন্থি সেক্যুলারিস্টদের হাতে। বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেছে পাকিস্তানেও। বিপ্লবের পর যতদিন বুদ্ধিবৃত্তি,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক বিপ্লবের কাজটি হয় না,ততদিন প্রতিবিপ্লবের হুমকি থেকেই যায়। মিশরে সেটি এখনও হয়নি। সেটি এত দ্রুত সম্ভবও নয়। প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে হুসনী মোবারক উৎখাত হলেও তাঁর বহুবছরের সহযোগীরা বহাল তবিয়তে রয়ে গেছে প্রায় প্রতি দফতরে। বিশাল সংখ্যায় তাদের অবস্থান দেশের বিচারব্যবস্থায়। বিচারকগণ তাদের পেশা ও কলমকে ব্যবহার করছে বিপ্লবের বিরুদ্ধে হাতিয়ার রূপে। একই ভূমিকায় নেমেছে দেশের মিডিয়া বক্তিবর্গ। দেশের শাসনত্ন্ত্র তৈরীর জন্য জনগণের ভোটে একটি পরিষদ নির্বাচিত হয়েছিল। কিন্তু মোবারকের আমলে চাকুরিপ্রাপ্ত এ বিচারকগণ সে নির্বাচনকেই অবৈধ ঘোষণা করে। এভাবে দেশের শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজটিই বিপদে পড়ে। মিশর ধাবিত হয় ভয়ানক শাসতান্ত্রিক সংকট। মুহাম্মদ মুরসি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েই এক ডিক্রি বলে বিচারকদের সে রায়কে অবৈধ ঘোষণা দেন। বিচারকদের নিয়ন্ত্রনের জন্য দেশে কোন শাসনতন্ত্র নাই। ফলে তারাই এখন দেশের সবচেয়ে বেপরোয়া স্বৈরাচারি গোষ্ঠি। সে সাথে সবচেয়ে প্রতিবিপ্লবী শক্তিও। নিজেদের কায়েমী স্বার্থের রায়কে তার ন্যায়বিচারের লেবাস পড়িয়ে জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। তারা এতটাই উগ্র যে,দেশের নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে তারা রাজপথে মিছিলও করেছে।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর একই রূপ প্রতিবিপ্লবী খেলা খেলেছিল সে দেশের প্রধান প্রচারপতি জাস্টিস মুনির। পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ক্ষতিটি সেদেশের চোরডাকাতেরা হাতে হয়নি। বরং সেটি করেছে সেদেশের প্রধান প্রচারপতি জাস্টিস মুনির একাই। তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি ছিলেন বগুড়ার মুহাম্মদ আলী। এবং শাসনতন্ত্র

2 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

তৈরীর কাজে লিপ্ত পাকিস্তান গণপরিষদের স্পীকার ছিলেন ফরিদপুরের মৌলভী তমিজুদ্দীন খান। শাসনতন্ত্র তৈরীর কাজ প্রায় শেষ,শুধু স্বাক্ষরের কাজটি বাঁকী। এমুহুর্তে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে। আর সে সময় আমলা থেকে গভর্নর জেনারেলের (রাষ্ট্রীয় প্রধান)পদে আসীন জনাব গোলাম মুহাম্মদ সে গণপরিষদকেই ভেঙ্গে দেন। বরখাস্ত করেন মুহাম্মাদ আলী বোগরাকে। এভাবে নস্যাৎ করে দেন শাসনতন্ত্র নির্মাণের কাজ। আর সে অবৈধ ভাঙ্গার বিরুদ্ধে মামলা হয়ছিল। অথচ সেটিকে বৈধ রূপে ঘোষণা দেন দেশের প্রধান প্রচারপতি জাস্টিস মুনির। আর গণপরিষদ ভাঙ্গার সে গর্হিত কাজকে মোবারকবাদ জানান তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সহরোয়ার্দী ও তার সেক্যুলার সঙ্গিসাথীরা। সে গাদ্দারির পুরস্কার স্বরূপ সহরোয়ার্দীকে প্রধানমন্ত্রীও বানানো হয়েছিল।

সেক্যুলারিস্টদের নাশকতা কোন বিশেষ একটি দেশে সীমিত নয়,সেটি দেশে দেশে। মুসলিম দেশের ভূগোল ভাঙ্গা ও মূসলমানদের দুর্বল করাই তাদের একমাত্র লক্ষ্য নয়। তাদের লক্ষ্য যেমন ঈমান ধ্বংস,তেমনি ইসলাম থেকে দূরে সরানোও। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংসদে একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত হলেও সেটি মাত্র দুই বছরের মধ্যে আস্তাকুরে নিক্ষিপ্ত হয় সামরিক স্বৈরাচারি শাসক আ।ইয়ুব খানের হাতে। ব্রিটিশগণ তাদের ১৯০ বছরের শাসনামলে ভারতে তিনটি সেক্যুলার প্রতিষ্ঠান রেখে যায়। এক. আর্মি, দুই. বিচারব্যবস্থা, তিন. প্রশাসন। কাফের অধিকৃত প্রতিটি মুসলিম ভূখন্ডে ইসলামের বিজয় এবং ইসলামী রাষ্ট নির্মানের পথে সবচেয়ে বড় বড় বাধা এসেছে এ তিনটি প্রতিষ্ঠান থেকে। সেটি যেমন পাকিস্তানে, তেমনি মিশরে। এ সেক্যুলার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পাকিস্তানে যে শাসনতান্ত্রীক সংকট সৃষ্টি করা হলো তা থেকে পাকিস্তান আর বের হওয়ার সুযোগই পেল না। এবং সে সংকট নিয়েই ১৯৪৭ সালের বৃহৎ পাকিস্তানের মৃত্যু ঘটে ১৯৭১য়ে এসে। তেমন একটি শাসনতান্ত্রিক সংকট থেকে বেরিয়ে আসার পথে মিশরেও বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। মিশরই মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে সেক্যুলারিস্ট কবলিত দেশ।

নাশকতা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে

হুসনী মোবারকের ২৮ বছরের স্বৈরাচারি শাসন নির্মূলের পর এই প্রথম সারাদেশে দুইবার স্বচ্ছ ও স্বাধীন নির্বাচন হলো। জনগণ এই প্রথমবার নিজেদের ইচ্ছামত নির্ভয়ে ভোট দিল। প্রথমটি ছিল দেশের সংবিধান তৈরীর লক্ষে শূরা পরিষদের নির্বাচন। দ্বিতীয়টি ছিল প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। দুইটি নির্বাচনের বিজয়ী হয়েছে ইসলামপন্থিরা,এবং শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়েছে সেক্যুলারিস্টরা। শাসনতন্ত্র নির্মানে দায়িত্বপ্রাপ্ত শূরা পরিষদের বড় সাফল্য হলো, অতিদ্রুত তারা একটি শাসনতন্ত্রও তৈরী করে ফেলেছে। প্রেসিডেন্ট মুহম্মদ মুরসী ঘোষণা দিয়েছেন,১৫ ডিসেম্বর অনুষ্টিত হবে আরেকটি গণভোট। সেটি হবে রচিত শাসনতন্ত্রের উপর রেফারেন্ডাম। জনগণ পাবে সে সংবিধানটি অনুমোদন বা প্রত্যাখান করার অধিকার। কিন্তু এ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সেক্যুলারিস্টগণ খুশি নয়। তারা খুশি নয়,সংবিধান এত তাড়াতাড়ি প্রণীত হওয়াতেও। খুশি নয়,জনগণের সামনে সে সংবিধান রেফারেন্ডামের জন্য পেশ করায়।

3 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

ইসলামপন্থিদের বড় ভরসা হলো জনগণ। কারণ,তারা জানে জনগণ রয়েছে তাদের সাথে। ফলে নির্বাচন যতবারই হবে,ততবারই তারা নির্বাচিত হবে। ইসলামপন্থিদের এখানেই শক্তি। অপরদিকে সেক্যুলারিস্টদের ভয়ের বড় কারণ হলো এই জনগণ। বিগত নির্বাচনের ন্যায় আগামী নির্বাচনেও তাদের পরাজয়টি যে সুনিশ্চিত সেটি তারা বুঝে। ফলে নির্বাচনকে তারা সযন্তে পরিহার করতে চায়। তারা রাজপথ নিয়ে থাকতে চায়। সে কারণেই সেক্যুলারিস্ট পক্ষটি সংবিধানের উপর রিফারেণ্ডাম নিয়ে খুশি নয়। কারণ তারা জানে,জনগণের রায়ে সেটি পাশ হয়ে যাবে। তারা জানে,শূরা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্টদের হাতে সংবিধানকে ইসলামিকরণের যে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেটি ভোটে গিয়ে তাদের পক্ষে বানচাল করা সম্ভব নয়। ফলে তারা রাজপথে গোলযোগের পথ বেছে নিয়েছে।তারা দাবী তুলেছে রেফারেন্ডাম মুলতবি করতে হবে।

সেক্যুলারিস্টদের নেতা রূপে আবির্ভূত হয়েছেন মুহাম্মদ বারাদাই। তিনি একসময় জাতিসংঘের পারমাণবিক শক্তি বিষয়ক কমিটির প্রধাণ ছিলেন। পশ্চিমা মহলের তিনি অতি কাছের লোক, তারা তাকে নোবেল প্রাইজও দিয়েছে। তাঁর সাথে আছেন আমরু মূসা। তিনি আরব লীগের সাবেক সেক্রেটারি জেনারেল। একসময় হুসনী মোবারকের পররাষ্ট্র মন্ত্রী্ও ছিলেন। সাথে আরো আছে মোবারক আমলের আরো বড় বড় কর্মকর্তা। তারা বেছে নিয়েছেন সংঘাতের পথ। অথচ একটি রক্তাত্ব সংঘাত ও নৈরাজ্য থেকে দেশকে বাঁচাতে প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদ মুরসী (৮/১২/১২)সকালে টিভি ভাষণে বিরোধীদের প্রতি সংলাপের ডাক দেন। বিরোধীদের প্রতি সংলাপের ডাক দিয়েছেন,ইখওয়ানুল মুসলিমীনের মুরশিদে আম জনাব মুহাম্মদ বাদি। কিন্তু সংলাপে যোগ দেয়ার আগ্রহ বিরোধী পক্ষের নাই। বিরোধী পক্ষের নেতা মুহাম্মদ বারাদাই সংলাপের শর্ত্ব রূপে দুই দফা দাবী পেশ করছেন। প্রথম দাবী,সংবিধানের উপর ১৫ই ডিসেম্বরের রেফারেন্ডাম মুলতবি করতে হবে। দুই,প্রেসিডেন্ট নিজেকে মোবারক আমলের বিচারকদের রায়ের উর্দ্ধে রাখার যে ডিক্রি জারি করেছেন সেটি বাতিল করতে হবে। সর্বশেষ খবরে প্রকাশ (আল জাজিরা,৯/১২/১২),প্রেসিডেন্ট মুরসী তাঁর ঘোষিত পূর্বের ডিক্রিতে সংশোধন এনে তার ক্ষমতাকে হ্রাস করেছেন। কিন্তু বিরোধী পক্ষ তাতে খুশি নয়,তারা তাদের গোল পোষ্টই পাল্টিয়ে ফেলেছে। তাদের নতুন দাবী, মুরসীকে পদত্যাগ করতে হবে। এর অর্থ,তারা কোন আপোষে রাজী নয়। দেশ একটি সংবিধান পাক সেটি তারা চায় না। অপর দিকে প্রেসিডেন্ট দায়বদ্ধ,শূরা পরিষদ কর্তৃক প্রণীত শাসতন্ত্রকে জনগণের সামনে পেশ করায়। ফলে রেফারেন্ডাম থেকে পিছু হটার পথ তার সামনে খোলা নেই। রেফারেন্ডাম না দিলে তিনি দায়িত্ব পালনে অবহেলার অপরাধ করবেন,সে অপরাধে তাঁকে আদালতে দাঁড়াতে হতে পারে। এমন অপরাধে তিনি তখন বৈধতা হারাবেন। শাসনতন্ত্র অনুমোদনের পরই প্রেসিডেন্ট চাচ্ছেন বর্তমান শূরা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে পার্লামেন্ট নির্বাচন দিতে। এরপর নির্বাচিত সংসদ থেকে সরকার গঠন করতে চান। প্রেসিডেন্ট মুরসী চাচ্ছেন,দেশকে এভাবে অতি দ্রুত অস্থিতিশীলতা থেকে মুক্তি দিতে। অথচ বিরোধী দলের দাবী,প্রেসিডেন্ট মুরসীকে পদত্যাগ করতে হবে। কিন্তু কথা হলো, তিনি পদত্যাগ করলে দায়িত্ব কে নিবে? তখন যে শূণ্যতা সৃষ্টি হবে তাতে কি আরেকটি সামরিক অভ্যুর্ত্থানকেই অনিবার্য করবে না? দেশকে আরেক অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ঠেলে দিবে না? অথচ সেক্যুলারিস্টগণ জেনেবুঝে দেশকে এক অস্থিতিশীল অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। অপর দিকে শূরা পরিষদের প্রধান দুটি দল ইখওয়ানুল মুসলিমীন এবং আল নূর পার্টি (সালাফী)র পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট মুরসীর উপর চাপও কম নয়। তাদের পক্ষ থেকে দাবী,রিফারেণ্ডামের দিন কোনভাবেই পিছানো যাবে না। তাদের কথা,সংবিধানিক সংকট থেকে উত্তরণে কোনরূপ দেরী করা যাবে না।

4 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

যুদ্ধ দুটি দর্শনের

লক্ষ্যণীয় হল,নির্বাচনে পরাজিত সেক্যুলারিস্টগণ শাসতান্ত্রিক ইস্যুকে তারা সংসদ থেকে রাজপথে নিয়ে এসেছে। শাসনতন্ত্র তৈরীর জন্য যে শূরা পরিষদ গঠিত হলো সেখানে তাদের প্রতিনিধিরা আলোচনায় অংশগ্রহণে রাজী নয়। গণতন্ত্রের নিয়ে এই হলো সেক্যুলারিস্টদের বিশ্বাস। তাদের কথা, সংবিধানে তাদের মতামত স্থান পায়নি। শূরা পরিষদের প্রণীত সংবিধানকে বলছে ইসলামপন্থিদের সংবিধান। কথা হলো,শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে তাদের বক্তব্যগুলো বিগত দুটি নির্বাচনে তারা বার বার রেখেছে। লাগাতর রেখে চলেছে দেশের মিডিয়াতেও। কিন্তু জনগণ সেগুলোকে গ্রহণ করেনি। ফলে তাদের কথাগুলো সংবিধানে ঢুকানো হলে গণতন্ত্রের মূল্য থাকে কি? জনগণ তো তাদেরকে সংবিধান রচনার যোগ্য রূপেই গণ্য করেনি। ফলে এখন কোন অধিকারে তারা তাদের পরিত্যক্ত ধারণাগুলোকে সংবিধানে স্থান দিতে বলে? সে কাজের জন্য তো তাদের নির্বাচিত হয়ে আসতে হবে। দেশের সংবিধান কীরূপ হবে সেটি নির্ধারণের দায়িত্ব তো নির্বাচিত শূরাসদস্যদের।

সমজাতের সেক্যুরাস্টিগণ যখন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র তৈরী করে তখন তাদের আচরণটি ছিল আরো অদ্ভুত। ১৯৭৩য়ের সংবিধান রচনার জন্য তারা দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল না। সে উদ্দেশ্যে তারা নির্বাচিতও হয়নি। তারা নির্বাচিত হয়েছিল ১৯৭০ সালে অখন্ড পাকিস্তান আমলে। এবং সেটি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ‘লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ডিক্রি বলে। আওয়ামী লীগের নেতাগণ তাদের প্রভু ভারত,রাশিয়া,নিজেদের প্রবৃত্তি ও ঘাড়ে বসা শয়তান কে খুশি করতে সংবিধানে আল্লাহর উপর আস্থা ও ইসলামের প্রতি অঙ্গিকারকে আস্তাকুরে ফেলে। সংবিধানের মূলনীতি রূপে জাতীয়তাবাদ,ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে লিপিবদ্ধ করে। অথচ মুসলমান হওয়ার মূল দায়বদ্ধতাটি হলো,আল্লাহর উপর বিশ্বাসকে মু’মিন ব্যক্তি হৃদয়ে লুকিয়ে রাখবে না,কথা,কর্ম, রাজনীতি ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়েও জাহির করবে। সেটি যেমন প্রকাশ পাবে তার ব্যক্তিগত এজেন্ডাতে, তেমনি দেশের শাসনতন্ত্রেও। মুসলমান মাত্রই প্রবল ভাবে সোবেইসলামের পক্ষ নিবে, ইসলাম ও অনৈসলামের দ্বন্দে নিরপেক্ষতা এখানে হারাম। নিরপেক্ষতা এখানে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কুফরি। ইসলামের পক্ষে প্রতিটি ঈমানদার শুধু তার নিজের কথা ও লেখনীকেই কাজে লাগাবে না,প্রয়োজনে নিজের শ্রম,অর্থ,রক্ত এবং প্রাণও দিবে। সেরূপ কোরবানী হাজার হাজার সাহাবা যেমন দিয়েছেন,সাহাবাদের পর বহু লক্ষ মর্দে-মু’মিনগণও দিয়েছেন। তাদের সে কোরবানীর বরকতেই তো মুসলমানগণ বিশ্বশক্তি রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এবং ইসলামের বিজয় এসেছে নানা দেশে। মিশরের ইসলামপন্থিগণ তো সে অঙ্গিকার নিয়েই অগ্রসর হতে চায়। কিন্তু সেটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেছে সেক্যুলারিস্টগণ। ফলে মিশরের বর্তমান সংঘাতটি নিছক দুটি রাজনৈতীক পক্ষের নয়,বরং দুটি ভিন্ন দর্শনের। ফলে কোন ব্যক্তির পদত্যাগ বা অপসারণে এ যুদ্ধ থামার নয়।

আল্লাহর অবমাননা মুসলিম দেশে

5 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

কোন মুসলমানই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না। ঈমানের প্রকাশ এবং ইসলামি সংস্কৃতির মূল উপাদানটি হলো,প্রতি কর্মে ও প্রতি সিদ্ধান্তে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর শরিয়তের পক্ষ নেয়ার বিষয়টিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত রাখা। একারণেই মুসলিম দেশের সংবিধানে গুরুত্ব পায় আল্লাহর উপর আস্থা ও তাঁর শরিয়তের প্রয়োগ।। নইলে মুসলমানের ঈমানদারির প্রকাশ ঘটে না। বরং তাতে প্রচণ্ড অবাধ্যতা হয় মহান আল্লাহর। তাই শতকরা ৯১ ভাগ মুসলমানের দেশে সংবিধান রচিত হবে অথচ সেখানে আল্লাহর নাম,আল্লাহর উপর আস্থা ও তাঁর শরিয়তি আইন গুরুত্ব পাবে না -সেটি কি তাই কল্পনা করা যায়? এটি তো আল্লাহর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ,অসম্মান ও অবমাননা। অথচ বাংলাদেশে ১৯৭২য়ের সংবিধানে সেটিই হয়েছে। আরো লক্ষণীয় হলো,আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ,অসম্মান ও অবমাননার এ দলীলটিকে অনুমোদনের জন্য জনগণের সামনেও পেশ করা হয়নি। এ সংবিধানের নির্মাতারা সেটিকে চাপিয়ে দিয়েছে জনগণের উপর। একই রোগ ভর করেছে মিশরের সেক্যুলারিস্টদের ঘাড়ে। তারাও চায় না,আল্লাহর উপর বিশ্বাস এবং শরিয়তের আইনের প্রতি অঙ্গিকার ঘোষিত হোক দেশের সংবিধানে।ফলে অবমাননা বাড়াতে চায় মহান আল্লাহর।

মুসলমানের ঈমান শুধু নামায-রোযা,হজ-যাকাতে ধরা পড়ে না। ধরা পড়ে রাজনৈতীক বিশ্বাস,রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও সংস্কৃতিতে। মুসলমানের মসজিদ যেমন গীর্জা-মঠ-মন্দির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর,তেমনি ভিন্নতর হলো মুসলিম দেশের সংবিধান কাফেরদের সংবিধান থেকে। মুসলিম সংবিধানের বৈশিষ্ঠটি হলো,তাতে থাকে ইসলামী অনুশাসনের প্রবল উপস্থিতি। অথচ বাংলাদেশের সংবিধানে সেটি ঘটেনি। সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টগণ যা করেছে তা হলো ভারত,ব্রিটেন বা এ ধরণের কাফের দেশের অনুকরণ। সকল দেশের মুসলিম,খৃষ্টান,ইহুদী ও হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি এক ও অভিন্ন,কারণ বিশ্বাসের কোন ভৌগলিক সীমারেখা থাকে না। তেমনি অভিন্ন হলো সকল দেশের সেক্যুলারিস্টদের রাজনৈতীক বিশ্বাস ও সংস্কৃতি। ফলে বাংলাদেশের সেক্যুলারিস্টগণ মহান আল্লাহ ও তাঁর শরিয়তের বিরুদ্ধে যে আচরণ করেছে সেক্যুলারিস্টগণ আজ সেটিই করছে মিশরে।

সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে আল্লাহর বিরুদ্ধে শুধু বিদ্রোহই হয়নি,মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে প্রচণ্ড অবমাননাও হয়েছে। সেটি হয়েছে সংবিধানে মহাশক্তিময় আল্লাহতায়ালাকে সার্বভৌম রূপে স্বীকৃতি না দিয়ে। কোন ঈমানদার ব্যক্তি কি মহান আল্লাহর প্রতি এ অবমাননা সহ্য করতে পারে? সার্বভৌমের অর্থ কি? সার্বভৌম তো তিনিই যিনি কারো অধীন নন। যার উপর কারো হুকুম চলে না। যিনি কারো মুখাপেক্ষি নন। যার রচিত আইনই চুড়ান্ত। সে মহান সত্তা তো একমাত্র মহান আল্লাহ। ইসলামের তো এটি অতি মৌল বিশ্বাস। সে মৌল সত্যের স্বীকৃতি না দিলে কি ঈমান থাকে? সে সার্বভৌম মহান আল্লাহর আসনে অন্য কাউকে বসানো তো প্রচন্ড বেঈমানি। অথচ সে বেঈমানিটাই বাংলাদেশের সাংবিধানিক বিধান। নবীজী (সাঃ)কে নিয়ে কার্টুন আঁকার মাঝে যে অবমাননা,আল্লাহরাব্বুল আলামীনের সাথে কৃত এ অবমাননাটি কি তার চেয়ে কম? ফলে আল্লাহর যে অবমাননার হচ্ছে সুইডেন,ডেনমার্ক বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে,তার চেয়ে কি কম অবমাননা হচ্ছে বাংলাদেশে? অথচ সে অবমাননাতেই বাধ্য করা হচ্ছে জনগণকে। আল্লাহতায়ালা যে সার্বভৌম সে কোরআনী সত্যকে মুছে ফেলতে বাধ্য করা হচ্ছে ইসলামী দলগুলোর গঠনতন্ত্র থেকে। সেটি না করলে তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার হুমকিও আসছে। কিন্তু এ নিয়ে সচেতনতা ক’জনের? বিস্ময়ের বিষয়,বাংলাদেশের মুসলমানদের মাঝে তা নিয়ে কোন ক্ষোভ নেই, দুঃখবোধ নাই,কোন প্রতিবাদও নেই। বরং সে অবমাননাকারিদের জনগণ ভোট দিচ্ছে,নেতা বলছে,বঙ্গবন্ধ বলছে,জাতির পিতা বলছে¸দেশনেত্রীও বলছে!

6 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

সেক্যুলারিস্টদের সন্ত্রাস ও আশা-নিরাশা

সেক্যুলারিস্টগণ মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও মনে প্রাণে তারা যে প্রচণ্ড স্বৈরাচারি সেটি কোন গোপন বিষয় নয়। সেটি যে শুধু মিশরের সেক্যুলারিস্টদের বিষয়,তাও নয়। বরং সে অভিন্ন চরিত্রটি বাংলাদেশসহ প্রতিটি মুসলিম দেশের সেক্যুলারিস্টদের। গণতন্ত্রকে তারা ততক্ষণই মানতে রাজি যখন সে গণতন্ত্রে তাদের বিজয় সম্ভব। বিজয় অসম্ভব মনে হলে সে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠানোই তাদের নীতি। সেটি যেমন মুজিবের বাকশালী শাসনে দেখা গেছে। তেমনি তুরস্কের কামাল পাশারর আমলেও দেখা গেছে। যে গণতন্ত্রে ইসলাপন্থিদের বিজয় ঘটে সে গণতান্ত্রকে গণতন্ত্র বলতে রাজি নয়। হামাসের বিজয় তাই পাশ্বাত্যে গণতন্ত্র বলে স্বীকৃতি পায়নি। মিশরে ইসলামপন্থিদের বিজয়ও তাই সেক্যুলারিস্টদের কাছে স্বীকৃতি পাচ্ছে না। একই কারণে বাংলাদেশে তারা কোন ইসলামপন্থিকে সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী দেখতে রাজি নয়। রাজপথে তাদের মিটিং করতে দিতেও রাজী নয়। আলজিরিয়ার সংসদ নির্বাচনে যখন ইসলামিক সালভেশন পার্টি বিশাল বিজয়ের পথে তখন সেদেশে সেক্যুলার সেনাবাহিনী গণতন্ত্রকেই কবরে পাঠিয়েছিল। সেদেশের সেক্যুলারিস্টগণই শুধু নয়,ইউরোপ-আমেরিকার সেক্যুলারিস্টগণও সামরিক জান্তাদের সে অভ্যুর্থাণকে পূর্ণভাবে সমর্থণ করেছিল। গণতন্ত্র হত্যাকেই শুধু নয়,হাজার হাজার ইসলামপন্থিদের নির্মম হত্যাকেও তারা সে সময় জায়েজ বলেছিল। একই অবস্থা দেখা গেছে তুরস্কে,যখন সে দেশের ইসলামপন্থি নেতা নাজিমুদ্দিন আর্বাকান নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিলেন। তাঁর সরকারকে বরখাস্ত করে তাঁকে জেলে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর দলকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। একই অবস্থা আজ বাংলাদেশেও। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্যা সরকারি দলের নেতাগণ জামায়াতে ইসলামির নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছে। অন্যদলের নির্মূল যে গণতন্ত্র নয়,বরং শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ -সাংবিধানিক সে বিধিটিকেও তারা মানতে রাজি নয়।

১৯৪৭ সালে সৃষ্ট বৃহৎ পাকিস্তান যে প্রতিবিপ্লবের কারণে শেষ হয়ে গেছে,এখন সে প্রতিবিপ্লবের মুখে পড়েছে আজকের মিশর। ইরানে বিপ্লব এখনও বেঁচে আছে বুদ্ধিবৃদ্ধি,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের ধারা অব্যাহত রাখায়। তারা শুধু শাহকেই বিতাড়িত করেনি,নির্মূল করেছে শাহের আমলের শিক্ষাব্যবস্থা,প্রশাসন, বিচারব্যবস্থা ও বুদ্ধিবৃত্তিকে। আর্মিকে পাশ কাটিয়ে গড়েছে সেপাইয়ে পাসদারানে ইনকিলাবে ইসলামী অর্থাৎ ইসলামী বিপ্লবের প্রতিরক্ষাবাহিনী। জনগণের কাতারে গড়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষের বাসিজ বা রাজাকার ফোর্স। শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্বৃত্তদের উৎপাদন বন্ধ করতে দেশের কলেজ-বিশ্ববিদ্যায়কে তারা তিনটি বছর বন্ধ রেখেছিল। অথচ মিশরে শুধু হুসনী মোবারকই অপসারিত হয়েছে,কিন্তু রয়ে গেছে তার আমলের সকল বিচারপতি, সকল সামরিক ও বেসামরিক অফিসার,সকল মিডিয়াকর্মী ও বুদ্ধিজীবীগণ। তারা এখন দল বেঁধে রাস্তায় নেমেছে বিপ্লবকে নির্মূল করার কাজে।

7 / 8

মিশরে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লবীদের নাশকতা

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Sunday, 09 December 2012 11:15 -

ইরানের বিপ্লবের বড় সৌভাগ্য যে তারা ইমাম খোমিনীর ন্যায় অসীম সাহসী,আপোষহীন ও প্রজ্ঞাবান নেতা পেয়েছিল। কিন্তু মিশরে খোমিনী নাই। আর দুর্বলতা হলো এ বিপ্লবকে পূর্ণ ইসলামী বিপ্লবে পরিণত করাতেও সেদেশের ইসলামপন্থিগণ তত্টা আগ্রহী নয়। আর সেটি না হলে আল্লাহর সাহায্যই বা তারা কীরূপে আশা করবে? আল্লাহর সাহায্য না আসলে বিজয়ই বা কীরূপে সম্ভব? পুরাপুরি আল্লাহর না হলে আল্লাহই বা কেন তাদের হবেন? তাছাড়া যে ইখওয়ানূল মুসলিমুন মিশরে ইসলামপন্থি প্রধান দল,সে দলটির মধ্যেও শুরু হয়েছে ভাঙ্গন। ভিতরে জোয়ারের পানি ঢুকেছে সেক্যুলারিজমের। প্রথম সারির এক নেতা আব্দুল মোনেম আব্দুল ফতুহ তো প্রেসেডেন্ট পদে মুরসির বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন। তিনি এখন মুরসীর বিরুদ্ধে গঠিত কোয়ালিশনের অন্যতম নেতা। আরেক সাবেক এক নেতা এবং বিলেতে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের সাবেক প্রতিনিধি জনাব কামাল হালবাবী সম্প্রতি সেক্যুলারিস্টদের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলা শুরু করেছেন। এভাবে সেক্যুলারিজমের জোয়ারে ভেসে গেছে দলটির বড় বড় বহু নেতা। তারা শরিয়ত প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে জোট বেঁধেছে সেক্যুলারিস্টদের সাথে। মিশরে ইসলামী বিপ্লবের এখানেই বড় দূর্বলতা। মিশরের বিপ্লব নিয়ে এখানেই আশা-নিরাশার দ্বন্দ। তবে সংকট মানুষের যোগ্যতাকে আরো শানিত করে। মনযোগী করে দুর্বলতাগুলোকে সনাক্ত করতে। বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই মানুষ অধিক বিপ্লবী হয়। বিজয়ের পথও তখন বের হয়ে আসে। কোন দেশে বিপ্লব শুরু না হলে সেটি হয় না। মিশরে বিপ্লবের সে প্রক্রিয়াটিও যে প্রবল ভাবে শুরু হয়েছে সেটিই সবচেয়ে আশাপ্রদ দিক। ০৯/১২/১২

8 / 8